প্রথম আলো

কলাম

মতামত

প্রাথমিকে বৃত্তি পরীক্ষা এবং নিউটনের বড় ও ছোট বিড়ালের গল্প

লেখা: রঞ্জু খন্দকার

আপডেট: ০৮ মার্চ ২০২৬, ১১: ৩০

প্রাথমিকে বৃত্তি পরীক্ষা দিতে পারে পঞ্চম শ্রেণির মোট শিক্ষার্থীর শতকরা সর্বোচ্চ ৪০ ভাগ। অন্যরা ইচ্ছা থাকলেও অংশ নিতে পারে না। *ফাইল ছবি*

গল্পটা হয়তো অনেকের জানা। তবু বলি। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করতেন। সে সময় তাঁর একটি পোষা বিড়াল ছিল। সেটি প্রায়ই ঘরের বাইরে যাচ্ছিল, আর আসছিল। এতে বারবার দরজা খুলতে হওয়ায় নিউটনের মনঃসংযোগে ব্যাঘাত ঘটে। এ থেকে বাঁচতে তিনি কাঠমিস্ত্রি ডেকে এনে দরজার নিচে বড় ফুটো করে নেন, যাতে বিড়ালটি অনায়াসে ভিতর-বাহির করতে পারে। কিছুদিন পর বিড়ালটি বাচ্চা দেয়।

তখন নিউটন আবার কাঠমিস্ত্রিকে ডেকে এনে আরেকটি ছোট ফুটো করতে বলেন, যাতে বিড়ালছানারাও যাওয়া-আসা করতে পারে। তখন কাঠমিস্ত্রি বলেন, ‘আগে থেকে ফুটো তো করাই আছে। আবার কেন?’ জবাবে নিউটন বলেন, ‘বড় ফুটো দিয়ে তো বড় বিড়ালটা যায়, ছানার জন্য ছোট ফুটো লাগবে না?’

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বৃত্তি পরীক্ষা নিয়ে সরকারের অবস্থান অনেকটা বিজ্ঞানী নিউটনের মতো হতে চলেছে। সরকার যদি কেন্দ্রীয়ভাবে পরীক্ষাই নিতে চায়, তবে সেটা প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) কেন নয়?

এমনিতে বিদ্যালয়গুলো বছরান্তে সব শিক্ষার্থীর বার্ষিক পরীক্ষা নিয়েই থাকে, সেটাই শুধু কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ে সেখান থেকেই তো ‘টপার’দের বৃত্তি দেওয়া যায়? আলাদা করে শুধু শ্রেণির সেরাদের পরীক্ষা নেওয়া অন্যদের সঙ্গে বৈষম্য নয়?

অভিজ্ঞতায় দেখেছি, বৃত্তি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে একধরনের প্রতিযোগিতা তৈরি হয়। তবে তা মোটেই ইতিবাচক নয়। বিদ্যালয়গুলো তাদের ভালো শিক্ষার্থীদের নিয়ে বৃত্তির জন্য আলাদা ব্যাচ করে অতিরিক্ত পাঠদানের ব্যবস্থা করে। এ কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ সময় বিদ্যালয়ের নিয়মিত পাঠদান ব্যাহত হয়, অনেক ক্লাস ফাঁকা যায়। অথচ ঘটা উচিত উল্টোটা।

এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, অনেক শিক্ষাবিদ প্রাথমিকে পাবলিক পরীক্ষারই বিরোধী। তাঁদের ভাষ্য, অল্প বয়সে পাবলিক পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের শুধু পরীক্ষার্থীই বানায়। শুধু শুধু শিক্ষার্থীদের মধ্যে গাইড বই পড়া ও কোচিংমুখী প্রবণতা বাড়ে। মানে তেমন ভালো ফল বয়ে আনে না। এই শিক্ষাবিদেরা এমনকি বৃত্তি পরীক্ষারও ঘোর বিরোধী।

এ বিষয়ে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি গণসাক্ষরতা অভিযানের পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলনও করা হয়। তা ছাড়া প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত পরামর্শক কমিটিও এ ধরনের সুপারিশ জমা দিয়েছে।

ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজেও এই মতের সমর্থক। কিন্তু শিক্ষাবিদদের সব পরামর্শ উপেক্ষা করে সরকার যদি বৃত্তি পরীক্ষাই নেয়, আমার মত হলো, তাহলে তা সবার জন্য কেন নয়? কেন তা প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী নয়?

এটা ঠিক, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর মতো পরীক্ষা নেওয়া সরকারের জন্য বিশাল ঝক্কির। কিন্তু সেটা তো এর আগে দীর্ঘ সময় করাও গেছে। প্রাথমিকে পাবলিক পরীক্ষা নিলে গাইড বই ও কোচিংমুখী প্রবণতা বাড়বে, সেটাও ঠিক। কিন্তু তা কি এখন থেমে আছে? শহরের ভালো স্কুল বা ক্যাডেটে ভর্তি কোচিং থেকে শুরু করে ভার্সিটি, বিসিএস—কোথায় নেই কোচিং? সমস্যা তো শুধু প্রাথমিকে নয়। সরকার শিক্ষা নিয়ে কোচিং-বাণিজ্য দূর করতে চাইলে সব কটির বিরুদ্ধেই কঠোর হতে পারে।

এর আগে পতিত আওয়ামী সরকারের আমলে প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতিতেও প্রাথমিকে পাবলিক পরীক্ষা নেওয়ার কথা বলা হয়নি। এরপরও ২০০৯ সাল থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়ন নেওয়ার পরিবর্তে কেন্দ্রীয়ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার (পিইসি) আয়োজন করা হয়। তা চলে ২০১৯ সাল পর্যন্ত। এরপর করোনাভাইরাসের কারণে তা বন্ধ হয়ে যায়।

করোনা বাংলাদেশের শিক্ষা খাতে যে ক্ষতি করেছে, তা সীমাহীন। এর মধ্যে একটিই ভালো কাজ করেছে, তা হলো ওই—পিইসি পরীক্ষা তুলে দেওয়া। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই তা আবার ফিরে আসে খণ্ডিতভাবে—প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা হিসেবে। ২০২২ সালে এ পরীক্ষা আবার চালু হয়। যদিও মাঝখানে নানা কারণে তা থেমে থেমে চলেছে, তবে নতুন সরকার ঘোষণা দিয়েছে, এবার মধ্য এপ্রিল থেকেই বৃত্তি পরীক্ষা আবার চালু হবে।

বৃত্তি পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণা জোগায়, সন্দেহ নেই; তবে তা শুধু ‘ভালো’দের মাঝেই। বাকি শিক্ষার্থীদের মধ্যে এ পরীক্ষা বরং হীনম্মন্যতা তৈরি করতে পারে; তৈরি করতে পারে নিজের প্রতি আস্থাহীনতার এক দুর্ভেদ্য দেয়াল।

অভিজ্ঞতায় দেখেছি, বৃত্তি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে একধরনের প্রতিযোগিতা তৈরি হয়। তবে তা মোটেই ইতিবাচক নয়। বিদ্যালয়গুলো তাদের ভালো শিক্ষার্থীদের নিয়ে বৃত্তির জন্য আলাদা ব্যাচ করে অতিরিক্ত পাঠদানের ব্যবস্থা করে। এ কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ সময় বিদ্যালয়ের নিয়মিত পাঠদান ব্যাহত হয়, অনেক ক্লাস ফাঁকা যায়। অথচ ঘটা উচিত উল্টোটা।

প্রাথমিকে একই শ্রেণিতে মোটাদাগে চার ধরনের শিক্ষার্থী থাকে—সাবলীল, পারগ, শিক্ষকের সহায়তায় পারগ ও অপারগ। এর মধ্যে শেষ দুই ক্যাটাগরির শিক্ষার্থীদেরই বিশেষ যত্ন প্রয়োজন। কিন্তু বৃত্তি পরীক্ষার কারণে ঘটে তার উল্টোটা। এ ক্ষেত্রে সাবলীলদেরও মধ্যে বাছাইকৃতদের নিয়ে হয় বিশেষ পাঠদান।

প্রাথমিকে বৃত্তি পরীক্ষা দিতে পারে পঞ্চম শ্রেণির মোট শিক্ষার্থীর শতকরা সর্বোচ্চ ৪০ ভাগ। অন্যরা ইচ্ছা থাকলেও অংশ নিতে পারে না। এতে একজন শিক্ষার্থীর মধ্যেও হীনম্মন্যতা তৈরি হলে তার দায় কে নেবে? যদি একজনের মধ্যেও নিজের প্রতি আস্থাহীনতা তৈরি হয়, পরবর্তী সময়ে তার মনের ভেতরের এই দুর্ভেদ্য দেয়াল কে ভাঙবে?

এমনিতে এখন বিদ্যালয়ভিত্তিক বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়াই হয়। ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হওয়ার জন্য দিতে হয় একটি প্রত্যয়নপত্র অথবা সনদ। এর পরিবর্তে যদি কেন্দ্রীয়ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা নেওয়া হয়, তবে সব শিক্ষার্থী সেখানে অংশ নিতে পারবে। দেওয়া যাবে একটি মানসম্মত সনদ। এর মধ্য থেকেই প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে বাছাই করে সেরা শিক্ষার্থীদের বৃত্তিও দেওয়া যাবে। এতে শিক্ষকদেরও বৈষম্য তৈরি করে গুটিকয় শিক্ষার্থীকে আলাদা পাঠদানের প্রবণতা কমে যাবে। বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়বে, তবে তা কিছুটা ইতিবাচকভাবে —সব শিক্ষার্থীকে ভালো করানোর দিকে।

কাজেই শুধু বৃত্তি দেওয়ার জন্য শিশুশিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টিকারী একটা পরীক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন আছে কি? বড় ও ছোট বিড়ালের জন্য আলাদা করে ফুটো তৈরি করার চেয়ে বড় একটা ফুটোই কি যথেষ্ট নয়?

রঞ্জু খন্দকার: লেখক ও শিক্ষক

alamgircj@gmail.com

(মতামত লেখকের নিজস্ব)

prothomalo.com

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান

স্বত্ব © ১৯৯৮-২০২৬ প্রথম আলো